ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

কামারুজ্জামান শহীদ ও তাঁর বই
‘ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ’

এক.

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান রাজনীতিবিদ, সংগঠক ও সাংবাদিক। প্রথমে তিনি জাতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপে আসেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে। পরে জামায়াতে ইসলামীতে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা ও কূটনৈতিক যোগাযোগের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখেন। জামায়াতের জ্যেষ্ঠ সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালনকালে শহীদ হন।

কামারুজ্জামানের জন্ম ১৯৫২ সালের ৪ জুলাই। শেরপুর সদরের বাজিতখিলা ইউনিয়নের মুদিপাড়া গ্রামে তার পৈত্রিক নিবাস। নিজ এলাকা শেরপুর থেকে সম্পন্ন করেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ। ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাশ করেন মোমেনশাহী নাসিরাবাদ কলেজ থেকে। ঢাকা আইডিয়াল কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে ১৯৭৬ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

মাধ্যমিকে পড়াকালেই কামারুজ্জামান ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ঢাকা মহানগরী সভাপতি মনোনীত হন। একই বছরের শেষ দিকে সেক্রেটারি জেনারেল হন। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে পরপর দুই সেশন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। তার সভাপতিত্বকালে ছাত্রশিবির সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শিবিরের বিজয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বড়ো কলেজগুলোতে শিবিরের বিস্তার লাভ তখন জাতীয় রাজনীতিতে হইচই ফেলে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে রাজনীতির পাদপ্রদীপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন কামারুজ্জামান।

শিবির থেকে বিদায় নেওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে কামারুজ্জামান জামায়াতের প্রচার সম্পাদক মনোনীত হন। এ সময়ে তিনি পেশাগত অঙ্গনেও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। *ঢাকা ডাইজেস্ট*-এর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে তিনি পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। *দৈনিক সংগ্রাম*-এর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বও সুচারুরূপে পালন করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য, বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্য হিসেবেও এ সময় ছিলেন সক্রিয়। আশির দশকের পুরো সময়টাতে তিনি একজন প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে কর্মমুখর ছিলেন।

যোগদানের মাত্র এক যুগের ব্যবধানে ১৯৯২ সালে কামারুজ্জামান জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন। জামায়াতের তখনকার রাজনৈতিক কাঠামোতে কামারুজ্জামানের এ পদপ্রাপ্তি বেশ দ্রুততর বলেই মনে হয়। কামারুজ্জামানের পেশাগত যোগ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা ও কূটনীতিক মহলে যোগাযোগদক্ষতা এক্ষেত্রে নিয়ামক হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনকালে কামারুজ্জামানকে আমরা প্রধানত কূটনীতিক যোগাযোগ, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে লিয়াজোঁ, বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিনির্ধারণ প্রভৃতিতেই বেশি সরব দেখি।

কামারুজ্জামানের এ বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাশীল ভূমিকার একটি দুর্বলতর দিকও আছে। দেখা যায়, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেখানে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব সাধারণত জননেতা হয়ে উঠতে পারেন না। আরও খোলাসা করে বললে, এ দেশের গণরাজনীতির যে চরিত্র বা সংস্কৃতি দাঁড়িয়েছে, সেখানে কোনো চিন্তাশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক মননসমৃদ্ধ মানুষ নিজেকে খুব একটা খাপ খাওয়াতে পারেন না। এ তিক্ত সত্যটি আমরা কামারুজ্জামানের গণরাজনীতির ময়দানের ভূমিকায় লক্ষ করি। তিনি জনদরদি নেতা ছিলেন এবং জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক ব্যাপক কাজ করেছেন বটে; কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে বিজয়ী হতে পারেননি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, তিনি ক্রমেই এ দুর্বলতা কাটিয়ে গণরাজনীতির মাঠেও পোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে তিনি সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনে তো তিনি বিজয়ীই ছিলেন, কিন্তু অপকৌশলে তার এ বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তিনি এ নির্বাচনে ১,১০,০৭০

ভোট পান। এ বিশালসংখ্যক ভোটপ্রাপ্তিকে কিন্তু জনগণের নিরেট ভালোবাসা ও আস্থার ভোটই বলতে হবে। কেননা, ভোটের রাজনীতিতে পেশিশক্তির ব্যবহার বা বিত্তের ব্যবহারের যে অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এর কোনোটাই তিনি করতে পারেননি।

দুই.

কামারুজ্জামান ছাত্রজীবন থেকেই লিখেছেন। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে তার রচনা বা বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি বলা যাবে না; অবশ্য খুব কমও নয়। তার রচনায় আমরা লক্ষ করি, তিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের প্রতি প্রতিভা বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধির আবেদন করেছেন। সদ্‌গুণাবলির অনুশীলন ও মেধার স্ফুরণের আকুতি জানিয়েছেন। আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য হয়ে ওঠার প্রস্তাব করেছেন। *আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, *আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব*, *ইসলামী নেতৃত্ব* বইগুলোতে আমরা এ আকুতি ও আকাঙ্ক্ষার ছাপ দেখতে পাই।

কামারুজ্জামানের রচনা ও চিন্তাধারার আরেকটি দিক হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সার্বক্ষণিক দৃষ্টিপাত। বৈশ্বিক পরিমণ্ডল সবসময় তার সামনে খোলা খাতার মতো থাকত। তিনি ইসলামী আন্দোলনকে কেবল একটি স্থানীয় জাগরণ হিসেবে না দেখে বৈশ্বিক জাগরণ হিসেবে দেখতেন। ফলে তার আলোচনায়, লেখায় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে উম্মাহ চেতনা বা আন্তর্জাতিক মানস পরিস্ফুটিত হতো। তার রচিত *আধুনিক বিশ্বে ইসলাম*, *বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী এবং তুরস্ক*, *আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ* ও *মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব* ইত্যাদি বই তারই প্রমাণ।

মৌলিক লেখালিখির পাশাপাশি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান অনুবাদক হিসেবেও ছিলেন দক্ষ। খুররম মুরাদের বিখ্যাত বই *কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা* তার অনুবাদকর্মের সৃষ্টিশীল উদাহরণ। তার এই কর্মটি নিছক ভাষান্তর না হয়ে একটি নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র সম্পাদকীয় এবং বিশ্লেষণাত্মক লেখাগুলো একজন প্রাজ্ঞ সম্পাদক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মর্যাদাও তার জন্য অপরিহার্য করে তোলে।

তিন.

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ কামারুজ্জামানের শেষ রচনা। কারাপ্রকোষ্ঠের নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ সময়গুলোতে তিনি এমন একটি দীর্ঘ লেখার প্রেরণা ও মানসিক স্থিরতা কীভাবে পেলেন, তা বিস্ময়করই বটে। লেখাটি শুরু হয়েছে পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের পরাধীনতার সূচনাকালের বিবরণ দিয়ে। তারপর তিনি সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে বিবরণী টেনেছেন ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনগুলোর। এরপর ব্রিটিশ শাসনামলের শেষদিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত মোটামুটি কোথাও সংক্ষিপ্ত কোথাও বিস্তৃতভাবে জাতীয় রাজনীতির একটি স্কেচ এঁকেছেন।

বইটির সবচেয়ে প্রাণবন্ত অংশের বর্ণনা শুরু হয়েছে একাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে। কেননা, এর আগপর্যন্ত যে বয়ান তিনি দিয়ে আসছিলেন, সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে নিছক একজন ইতিহাসপাঠকের পাঠের নির্যাস। কিন্তু একাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে যে বর্ণনা শুরু হয়েছে, সেখানে লেখক কেবল একজন পাঠক বা গবেষক নন; বরং তিনি নিজেই সেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী এবং নিজেই একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও বটে। একজন মেধাবী ছাত্রনেতা থেকে একজন প্রাজ্ঞ জাতীয় নেতার বিবরণীতে আমরা সত্তর, আশি, নব্বইয়ের দশক এবং এ শতাব্দীর শূন্য দশকের বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির বয়ান শুনতে পাই। এমন অনেক ঘটনার নেপথ্য বিষয়াদি এ অংশে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, আমরা এতদিন নিছক যার বাইরের আবরণ সম্পর্কে জানতাম। উল্লিখিত চার দশকের জাতীয় রাজনীতি ও জামায়াতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি সামগ্রিক ধারণা আমরা এখানে পেয়ে যাই, যা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দলিল ও প্রাইমারি সোর্স হওয়ার উপযুক্ত।

চার.

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বইটি লিখেছেন তার বড়ো ছেলে ওয়ামীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠির আদলে। 'প্রিয় ওয়ামী' বলে সম্বোধন করে তিনি লেখার প্রতিটি পর্ব শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন রচনার সময় ও তারিখ উল্লেখ করে।

সম্ভবত কারাবিধির বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি এভাবে চিঠিরূপে লিখেছেন। সংগত কারণেই সম্বোধনের এ অংশগুলো সম্পাদনাকালে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে কিছু কিছু পর্বে এ সম্বোধনটা বিভিন্ন কারণে প্রাসঙ্গিক ছিল, তাই কয়েকটি পর্বে সেই সম্বোধন অংশটা রেখে দেওয়া হয়েছে।

কামারুজ্জামান এ সম্বোধন অংশে বারবার আক্ষেপ করেছেন তার হাতের কাছে রেফারেন্স বইপত্র না থাকার। তিনি লিখেছেন, রেফারেন্স বইপত্র হাতের কাছে থাকলে তিনি বইটিকে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বইয়ে রূপান্তর করতে পারতেন। তিনি পুরো বইটিই লিখেছেন স্মৃতির ওপর নির্ভর করে। তবে তার এ লেখাটি পড়ে যারপরনাই বিস্মিতই হতে হয়, তার স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখে। তিনি ইতিহাসের সন-তারিখ, সংবিধানের বিভিন্ন ধারা-উপধারা, বিভিন্ন বইয়ের নানা অংশের মূলভাব ও লেখকের নাম এত চমৎকার ও নিখুঁতভাবে এনেছেন, যেন তার মানসপটে সেই ঘটনাবলি পুনরায় সবাক ও সচিত্র হয়ে উঠেছিল।

পাশাপাশি রেফারেন্সসমৃদ্ধ বই না হওয়ার কারণে আমাদের জন্য একধরনের উপকারও হয়েছে বটে, বইটি তথ্যের ভারে নীরস হয়ে ওঠেনি; বরং ঝরঝরে গদ্যের একটি অকৃত্রিম সুখপাঠ্য বই হয়ে উঠেছে। তথ্যসমৃদ্ধ বই হলে হয়তো এই সুখপাঠ্যতার বৈশিষ্ট্য থেকে বইটি বঞ্চিতই হতো। ফলে এটি একজন গবেষকের গবেষণাপ্রবন্ধ ধরনের রচনা হয়ে না উঠে একজন রাজনীতিবিদের আলাপি বয়ান হয়ে উঠেছে, যে আলাপ শীতের রোদে পিঠ লাগিয়ে ধূমায়িত চা পান করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাগ্রহে শোনা যায়।

পাঁচ.

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ রাজনীতিবিদ ও লেখক কামারুজ্জামানের আরও কিছু স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাধারা আমাদের সামনে পষ্ট করে তোলে। সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে, গুণের কদর ও দোষের সমালোচনার অকৃত্রিম হিম্মত ছিল তার। তিনি এ বইয়ে তার রাজনৈতিক ও আদর্শিক শত্রুদের সদ্‌গুণাবলিরও স্বীকৃতি দিয়েছেন আবার নিজের কিংবা নিজের দলের ভুল ও দুর্বলতাও অকপটে স্বীকার করেছেন। সামনের পথ নির্ধারণে অতীত পর্যালোচনায় জোর দিয়েছেন।

আরেকটি দিক আমরা দেখতে পাই তার চরিত্রে। আর তা হলো, ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সুদৃঢ় কমিটমেন্ট। সংগঠনের অভ্যন্তরে তার বেশ কিছু নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিষয়গুলো এভাবে হোক। কখনও তার মত গ্রহণীয় হয়েছে, আবার কখনও-বা অগ্রহণীয় হয়েছে। কিন্তু তার দ্বিমতের জায়গাগুলোতেও তিনি সামগ্রিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সবসময় তৎপর ছিলেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক একেবারে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের প্রারম্ভিকায় প্রলুব্ধকর প্রস্তাব পেয়েও তিনি তা এড়িয়েছেন আদর্শিক দায়বদ্ধতা ও দরদের জায়গা থেকে।

ছয়.

ঠিক আত্মজীবনী না হলেও *ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ* আত্মজীবনীর যে রস, রূপ, গন্ধ; তার কিছু কিছু আমাদের পাইয়ে দেয়। আবার আত্মজীবনীর যে আত্মবয়ান কিংবা বারবার 'আমি' শব্দ উচ্চারণের শ্রুতিকটুতা, তা থেকেও বইটি অনেকাংশে মুক্ত। সবমিলিয়ে এটি একাধারে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাস পাঠ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ ও আত্মজীবনীমূলক বইয়ের স্বাদ পাইয়ে দেবে পাঠককে।

বইটি শেষ করতে গিয়ে একধরনের আক্ষেপ পাঠকের মনে দানা বেঁধে উঠতে পারে যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনের সাথে সাথে বইটি তার বয়ান বন্ধ করে ফেলেছে একেবারে হুট করে; সমাপ্তির কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই। এটা কেন হয়েছে, তা আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কেননা, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত ছিল, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে যে সময়কালটা তিনি মুক্ত ছিলেন, সে সময়কার বর্ণনা, জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও তার গ্রেফতারি এবং বিচারের নামে তাদের ওপর যে অবিচার করা হয়েছে, তার বিবরণ তিনি দেবেন। কিন্তু তা না দিয়ে হঠাৎ করেই লেখাটি শেষ হয়ে গেছে। আর প্রতিটি পর্বে তিনি লেখার তারিখ উল্লেখ করলেও শেষ পর্বটির শেষে তারিখ উল্লেখ নেই। আগের পর্বের তারিখ লেখা ১৫ এপ্রিল, ২০১৪। তাহলে কি শেষের অংশটি কারাগার থেকে মিসিং? নাকি তিনি এর পরে লেখার মতো সুযোগ পাননি? মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে করা তার আপিল আবেদন ২০১৪ সালের ৬ এপ্রিল খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। আপিল খারিজ হওয়ার কারণে তাঁর শাহাদাত

অনেকটা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় নিশ্চিত শাহাদাতের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ এক বছর তিনি প্রতিটি দিন ও রাত অনিশ্চয়তার মধ্যে ফাঁসির সেলে কাটান। তখন কি তিনি লেখার পরিবর্তে তার রবের সাক্ষাৎলাভের আকাঙ্ক্ষায় ইবাদতে অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন?

এর সবই আমাদের অনুমান। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছুই জানি না। শুধু এটাই জানি, এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে টানা এক বছর অপেক্ষমাণ থাকার পর ফাঁসির দণ্ড কার্যকরের দিন বিকেলে তাকে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার অপশন দেওয়া হয়; জবাবে তিনি বলেন—"প্রাণের মালিক আল্লাহ। রাষ্ট্রপতি জীবন দেওয়ারও মালিক নন এবং নেওয়ারও মালিক নন যে, তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইব।"

২০১৫ সালের ১১ এপ্রিল রাত সাড়ে দশটায় ফাঁসির মঞ্চে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান শাহাদাতবরণ করেন। আর শাহাদাত তো এমন এক জীবনের সমাপ্তি, যা অগণন মানুষের প্রাণে প্রাণে সঞ্চার করে দেয় নতুন জীবন, নতুন হিম্মত, নতুন উদ্দীপনা। এ যেন জীবনের শেষ নয়; বরং অগণন জীবনের সূচনা।

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান
১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

ইসলামী আন্দোলন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ১৯

যুবসমাজের মধ্যে ইসলামী জাগরণ :
ইসলামী আন্দোলনের বড়ো অবদান ২০

ইসলামের শিক্ষা বাংলাদেশের মাটির গভীরে ২১

পলাশির প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলো ২২

১৯০ বছরের ব্রিটিশ দখলদারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ২৩

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের অন্তরালে ২৫

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ২৬

বালাকোটের শহীদদের কথা ২৭

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ২৮

বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী পরিস্থিতি ২৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ৩১

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ৩১

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ ৩২

এক হাজার মাইল ব্যবধানের দুই খণ্ড ভূমির রাষ্ট্র পাকিস্তান ৩৪

পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্রধারণা ৩৫

ভাষা আন্দোলন ৩৬

হিন্দু শাসনকালে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করা হয় ৩৮

ব্রিটিশ শাসনকালেই শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক ৪০

মুসলমান শাসকরাই বাংলার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ৪১
বাংলা ভাষা বিকৃতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে ৪২
বাঙালি ও বাংলাদেশি বিতর্ক ৪২
বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার নামে যা হচ্ছে ৪৩
কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কথা ৪৬
ছাত্র আন্দোলন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৫৩
মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ কৃষক সন্তানদের ভূমিকা ছিল প্রধান ৬৮
শেখ মুজিবের সতর্কতা ও ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার ৭১
স্বাধীন দেশ পরিচালনায় আওয়ামী লীগের পরিকল্পনাহীনতা ৭৪
জাতীয় ঐক্যের কোনো চিন্তাই করা হলো না ৭৭
মুক্তিযুদ্ধে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের অবদান এবং
বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গ ৭৯
আদর্শিক বিভ্রান্তি ৮১
প্রশাসনিক ব্যর্থতা :
দলীয় লোকদের বেপরোয়া ও নিয়ন্ত্রণহীন লুটপাট ৮৪
দালাল আইন, সাধারণ ক্ষমা ও
১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচারে ১৯৭৩-এর আইন ৮৭
রক্ষীবাহিনী গঠন ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ ৯২
১৯৭৩ সালের নির্বাচন : কারচুপি করার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল ৯৩
সংবিধানের ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি আইন জারির বিধান ৯৩
প্রবাসী সরকার ও তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি আচরণ..... ৯৫
ভারতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান..... ৯৭
জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর..... ৯৮
এত দ্রুততম সময়ে কেন ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি হলো ৯৯
পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট ১০২

সংবাদপত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের বৈরিতা ও অসহিষ্ণুতা ১০৪
সিরাজ শিকদার ও চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী হত্যা ১০৬
একদলীয় বাকশালী শাসন : শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড়ো ভুল ১০৭
১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডি ১১০
৭ নভেম্বরের গণ-অভ্যুত্থান ১১৫
১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডির নেপথ্য কারণ ১১৮
শেখ মুজিবের পতনে ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের ১২৭
মেজর জিয়া থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়া ১২৯
রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনলেন জিয়া ১৩১
আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন পুরোনো দল পুনরুজ্জীবিত হলো ১৩৩
স্বনির্ভর ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার জিয়া ১৩৬
জিয়ার সমন্বয়ের রাজনীতি ও জাতীয় ঐক্য গড়ার প্রয়াস ১৪০
জিয়ার আবেদনে সাড়া দিতে পারলাম না ১৪১
দিল্লি থেকে ফিরলেন শেখ হাসিনা
আর সে মাসেই নিহত হলেন জিয়া ১৪৫
জিয়ার জানাযা ১৪৮
ক্ষমতাসীনরা যুগে যুগে
ইসলামী আন্দোলনের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে ১৫১
রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ভূমিকা ১৫৮
দুজন রাষ্ট্রপতি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৬০
রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ও কিছু ঘটনা ১৬৩
জেনারেল থেকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৬৬
জামায়াতের সমর্থন লাভের চেষ্টা এরশাদের ১৬৭
শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক ও এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সূচনা ১৬৯
জামায়াতের পক্ষ থেকে ব্যাপক রাজনৈতিক যোগাযোগ ১৭০

১৯৮৬ সালের নির্বাচন : দশ হুন্ডা, বিশ গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা ১৭৪
জামায়াতের দশ সংসদ সদস্যের পদত্যাগ ১৭৬
হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে যোগদান ১৭৭
আব্বাস আলী খানকে অভিনন্দন জানিয়ে
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর চিঠি ১৭৯
কেয়ারটেকার সরকারের ফরমুলা এবং এরশাদের পদত্যাগ ১৮২
১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে
প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ১৮৫
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :
অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ১৮৬
জাতীয় সংসদে জামায়াতের মহিলা সংসদ সদস্য ১৮৭
বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা : প্রধানমন্ত্রীর ডিক্টেটরশিপ ১৮৮
অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতের আমীর ঘোষণা :
নির্মূল কমিটি গঠিত ১৯১
অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতার : এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ১৯৩
নাগরিকত্ব প্রশ্নে হাইকোর্টে বিভক্ত রায় ১৯৬
হাইকোর্টের একক বেঞ্চে নাগরিকত্বের পক্ষে রায়
আপিল বিভাগে বহাল ১৯৭
বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত সমাবেশে
অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক ভাষণ ২০০
কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নতুন করে শুরু ২০৩
মাগুরা উপনির্বাচনের পর
আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির যুগপৎ আন্দোলন ২০৭
জেনারেল নাসিমের ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ২১২
১৯৯৬ সালের নির্বাচন :
২১ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে এলো আওয়ামী লীগ ২১৪

আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন : কতিপয় ঘটনা ২১৯
১৯৯৬ সালের নির্বাচনের বিপর্যয়
কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা জামায়াতের ২২৩
চারদলীয় জোট গঠন : সরকারবিরোধী আন্দোলনের নতুন মাত্রা ২২৬
চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের জনসভা শুরু পল্টন থেকে..... ২৩০
এরশাদের চারদলীয় জোট ত্যাগ..... ২৩১
সংবিধানবিরোধী পার্বত্য শান্তিচুক্তি : চারদলীয় জোটের লংমার্চ..... ২৩২
চারদলীয় জোটের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন..... ২৩৬
নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয় ২৪২
চারদলীয় জোটের সরকার পরিচালনা ও রাজনীতি ২৪৪
জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততা ও নিষ্ঠা ২৪৬
কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাওলানা নিজামী..... ২৪৮
জোট সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে
মহানগর নাট্যমঞ্চের অনুষ্ঠান ২৫২
জামায়াতের ইফতার পার্টিতে এরশাদের দাওয়াত প্রসঙ্গ..... ২৫৪
জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততা সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২৫৭
গণমাধ্যম ও জোট সরকার ২৫৯
একটি টিভি চ্যানেলের আত্মকথা ২৫৯
চারদলীয় জোট সরকারে জামায়াতের অর্জন ২৬৫
চারদলীয় জোট সরকারের পারফরম্যান্স ২৬৮
বিএনপি-জামায়াত সম্পর্ক ও খালেদা জিয়া ২৭০
চারদলীয় জোট সরকারের শেষের দিকের কিছু ঘটনা ২৭৪
২৮ অক্টোবর ২০০৬-এর ট্র্যাজেডি :
হাসিনার লগি-বৈঠার তাণ্ডব ও বর্বরতা ২৭৮
জরুরি আইন জারি : বদলে গেল দৃশ্যপট ২৮১

সেনাসমর্থিত সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ব্যর্থ হলো ২৮৩
'মাইনাস টু' ফরমুলা ও সংস্কারের রাজনীতি ২৮৩
মতিউর রহমান নিজামী গ্রেফতার : জামায়াতের তীব্র প্রতিক্রিয়া ২৮৫
চারদলীয় জোট চাঙা হলো ২৮৫
জাতীয় প্রেসক্লাবে আমার ওপর আওয়ামী গুন্ডার হামলা..... ২৮৭
আইডিবি ভবনে একটি সেমিনারের ঘটনা ২৮৮
'মাইনাস টু' ফরমুলা : ডিজিএফআইয়ের কারসাজি..... ২৯০
তারেক রহমানের ওপর অকথ্য নির্যাতন..... ২৯১
জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেলের মন্তব্য :
যুদ্ধাপরাধী ইস্যু নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ২৯৩
বিএনপি ভাঙার চেষ্টা ডিজিএফআইয়ের :
প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা..... ২৯৬
ড. মুহাম্মদ ইউনুসের রাজনৈতিক দল 'নাশ' প্রসঙ্গ ২৯৮
ফখরুদ্দীন সরকারের ব্যর্থতা ৩০৩
নবম সংসদ নির্বাচনে বিএনপির কৌশলের ত্রুটি..... ৩১১
নবম সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতের ভুল..... ৩১২



ইসলামী আন্দোলন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়

স্কুলে অধ্যয়নকালে ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আমি আমার শিক্ষক বা পিতা-মাতা থেকেও যে শিক্ষা পাইনি, ইসলামী আন্দোলন আমাকে সেই শিক্ষার সন্ধান দেয়। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে যে গতিতে পড়ালেখা করে আসছিলাম, এই আন্দোলনের সংস্পর্শে না এলে হয়তো-বা আমার অন্যান্য সহপাঠীদের মতো কোনো চাকরিবাকরি ইত্যাদি করতাম; জীবনটা সম্পূর্ণ ভিন্নখাতেই প্রবাহিত হতো। ইসলামের যে শিক্ষা ইসলামী আন্দোলনের সাহচর্যে পেয়েছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহর সন্তোষ লাভই আমার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন আমাকে সেই হিদায়াতের ওপর টিকিয়ে রাখেন, এই আমার প্রার্থনা।

ইসলামী আন্দোলনের বদৌলতে আজ বাংলাদেশের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে যে বিরাট কাফেলা গড়ে উঠেছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড়ো নিয়ামত। একতরফা মিথ্যা প্রচারণা ও বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এই কাফেলা এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায়, একদিন এরাই বাংলাদেশকে বদলে দেবে, ইনশাআল্লাহ। এই কাফেলায় শরিক থেকে আমি যতটুকু কাজ করতে পেরেছি, তার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

ইসলামী আন্দোলন থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি, আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগির মধ্যেই মানবজাতির মুক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

> "হে মানবজাতি, তোমরা সেই আল্লাহর বন্দেগি করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো বা মুক্তি পেতে পারো ।" সূরা বাকারা : ২১

আল্লাহর ইবাদতই মানবজাতির মুক্তির রাজপথ, অন্য কোনো পথে মানবতার মুক্তি নেই।

যুবসমাজের মধ্যে ইসলামী জাগরণ : ইসলামী আন্দোলনের বড়ো অবদান

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল-মাদরাসার ছাত্রসমাজের এক বৃহত্তর অংশ ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেও ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিকতা, দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও ইসলামী আদর্শের অনুশাসনে যেভাবে এগিয়ে এসেছে, তা বাংলাদেশে এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। অধার্মিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বস্তুবাদী ভোগবাদিতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ইসলামপন্থি ছাত্ররা যেভাবে সংগঠিত হয়েছে, তা ইসলামের দুশমনদের মধ্যে হৃৎকম্পন সৃষ্টি করেছে। সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কর্মসূচি, ইসলামের সর্বজনীন আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অনুপম চরিত্র, কথা ও কাজের মিল ইত্যাদি কারণেই ইসলামপন্থি ছাত্ররা একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র অথবা ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের কোনো ইতিবাচক আদর্শ ও কর্মসূচি নেই। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি এবং ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবেই কাজ করছে তারা। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ক্ষমতা ও অস্ত্রের জোরে দখলদারত্বের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করাই এদের বৈশিষ্ট্য। এদের কর্মকাণ্ডকে স্লোগানসর্বস্ব একধরনের 'রাজনৈতিক টাউটগিরি' ছাড়া অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। এদের নেতৃত্বে মেধাহীন অস্ত্রধারী ক্যাডার ও অছাত্রদেরই প্রাধান্য। টেন্ডার ও চাঁদার ভাগ-বণ্টন এবং প্রভাব বিস্তারের জন্য এরা নিজেরাই সংঘাত ও খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়ে। প্রায়ই দেশের মানুষ সংবাদপত্রে ও টিভি চ্যানেলে এদের রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, চাপাতি, রামদা হাতে দেখতে পান। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শান্তিকামী দেশবাসী তাদের ব্যাপারে হতাশ ও উদ্‌বিগ্ন।

পক্ষান্তরে ইসলামপন্থি ছাত্রদের সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনমূলক কার্যক্রম মানুষের হৃদয় জয় করছে। সাধারণ ছাত্রদের মধ্য থেকেই শক্তি সঞ্চয় করছে ইসলামপন্থি ছাত্রদের এই আন্দোলন। বাংলাদেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান কলেজগুলোই এর প্রমাণ। ছাত্রসমাজের মাঝে

ইসলামের পক্ষে যে জাগরণের সূচনা হয়েছে, মেধাহীন ও অছাত্র নেতৃত্ব, অস্ত্রবাজ, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের স্লোগানধারীদের পক্ষে তা প্রতিহত করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

ইসলামের শিক্ষা বাংলাদেশের মাটির গভীরে

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান। হজরত শাহজালাল, শাহ আমানত, শাহ মাখদুম, খানজাহান আলী, হাজী শরীয়তুল্লাহ রাহি.-এর স্মৃতিবিজড়িত এই বাংলাদেশ এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। পীর-মাশায়েখ, আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদরাসা, মক্তব-খানকাহর দেশ এই বাংলাদেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ মানুষই নিজেদের অর্থ ও প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছে লক্ষ লক্ষ মসজিদ-মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বন্দুক দিয়ে শক্তির জোরে এ দেশের জনগণের ওপর ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইসলামের মহত্ত্ব, মানবকল্যাণমুখিতা ও সর্বজনীন আদর্শের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এই জনপদে আমাদের পূর্বপুরুষরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন দলে দলে। এ দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার আযানের ধ্বনি অনুরণিত হয়। বাংলাদেশের মাটি ও আলো-বাতাসের সাথে মিশে আছে ইসলাম। সুতরাং, ইসলামের শেকড় এ দেশের মানুষের হৃদয়ে, এ দেশের মাটির গভীরে।

(রাত ২:৩০ টা; ২ আগস্ট, ২০১৩)